অ মি ত মু খো পা ধ্যা য়

যে-পথে ডালপালা ছড়ায়

"গল্প শব্দটার অর্থ কেমন পালটে যাচ্ছে খেয়াল করেছিস? একজনের মুখে শুনলাম— 'গল্প দিস না'। মানে, বাজে কথা বলিস না। আর-একজন রাস্তায় ভিড় দেখে জানতে চাইল, 'গল্পটা কী দাদা'? গল্পই এখন ব্যাপার, ঘটনার পরিপূরক হয়ে উঠেছে।"

"যাই বলিস নীল, গল্প এখন পথে নেমে এসেছে," তমাল হাসে। "গল্প এখন বাস্তব, দু'বেলার রসদ। আয়োজন করে লেখা বা পড়ার দিন গেছে। কাগজে, পরদায়, হোর্ডিং-এ ঝুলছে গল্প। তোদের গল্প লেখা হুমকির মুখে পড়েছে। নতুন করে ভাবা শুরু কর, নইলে সব নেতিয়ে পড়বে।"

চন্দন বলে, "আমিও সেদিন শুনছিলাম একটা ছেলে তার বন্ধুকে বলছে— 'আরে ওর কথা আর জিজ্ঞাসা করিস না, ও তো এখন গল্প হয়ে গেছে।' এবার তুমি যা মানে করবার করে নাও!" তমাল যোগ দেয়, "অর্থাৎ তার বারোটা বেজে গেছে, বা সে অতীত হয়ে গেছে। আরো আছে, 'ও-সব ছেড়ে গল্পটা বলো তো!' মানে আসল কথাটা জানাও। বোঝ, শব্দটার কেমন ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে আজকাল।"

চন্দন ফের সূত্র ধরে, "জানিস, ছোটোবেলায়, ওই ছয়-সাত ক্লাসে, স্কুলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কী হতে চাও?' বললাম, 'আমি যা হতে চাই, তা হতে পারব না।' 'কেন?' 'না, গল্প বলার শিক্ষক হতে চাই।' সবাই ফিরে তাকাল। বোঝালাম যে, 'আমি মনে করি প্রত্যেক ক্লাসে প্রতিদিন একটা গল্পের ক্লাস থাকা উচিত। তেমনটা চালু হলে আমি গল্প বলার চাকরি করতাম।' মন্তব্য এল, 'শুধু গল্প বলার কাজ! তা কী আর হয়? অত গল্প পাবে কোথায়? ভেবে দেখেছ? তাছাড়া সিলেবাস শেষ হবে কেমন করে!' বলেছিলাম, 'তাই তো আমার ইচ্ছেপূরণ হবে না।' সত্যি, এখনো আমার সেই কথাই মনে হয়। গল্পের আগ্রহে ছাত্রছাত্রীদের কাছে টেনে বাকি পড়াটা আরো অনেক ভালোভাবে পড়ানো যায়।"

নীল অবাক, "সত্যি এরকম আছে রে, আমি কাগজে পড়েছি! এক সাংবাদিক খবর করতে গঞ্জ এলাকায় গেছিল, সম্ভবত বিহারের দিকে। সেখানে একজনের কাছে এরকম মানুষের খোঁজ পায় সে। লোকটা একটা কারখানায় কাজ করত। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে, সপরিবারে মহা বিপদে পড়ে। এটা-সেটা করে কিছুদিন চালালেও পাকা ব্যবস্থা হতে চায় না। প্রায় অনাহারে চলছে, এমন অবস্থায় কোনো-একটা ক্লাবের কিছু উৎসব চলছিল। সেখানে যে-বক্তা'র আসার কথা সে আসে নি, পরের অনুষ্ঠানের দলও এসে পৌঁছোয় নি। এই লোকটা এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আমি কথা বলে সময়টা কাটিয়ে দিতে পারি।' সুযোগ পেতেই সে জমিয়ে গল্প বলে শ্রোতাদের ভুলিয়ে রেখে সময়টা পার করে দেয়। তার মাঝে গানের

দল এসে পড়ে। চারপাশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে লোকটার গল্প। অনেকেই তার কথা শুনতে চায়। ফলে, ক্লাব থেকে আবার তাকে ডাকে। সেদিন লোকটা একের পর এক গল্প বলে গোটা সন্ধে পার করে দেয়। এরপরে আশেপাশের ক্লাবগুলো তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে। রাতারাতি সারা তল্লাটের সবচেয়ে জনপ্রিয় লোক হয়ে ওঠে সে। এবার এক হেডমাস্টার উদ্যোগী হয়ে স্কুলে একদিন একটা গল্পের ক্লাস করান। অন্য স্কুলগুলোও পিছিয়ে থাকবে কেন? সাংবাদিককে লোকটা জানিয়েছিল, কারখানার মাইনের প্রায় কাছাকাছি রোজগারে পৌঁছে গেছে সে। এখন তার সমস্যা হলো সময় বের করা। কারণ চাহিদা থাকলেও সব জায়গায় সে পার্ট-টাইমার। কিন্তু নানা জায়গায় ছোটাছুটি করতে হলেও একটা অজানা তৃপ্তির খোঁজ পেয়েছে।"

তমাল মন দিয়ে শুনলেও খানিক বিষণ্ণ, তাহলে গল্পগাছা করাটা কি আর ইনফরমাল ব্যাপার রইল না? গল্পের এমন প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদা তো আদতে তার রোগশয্যায় চলে যাবার মতো। ভালো-লাগার বদলে ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। এরপর গল্প বলতে থাকবে শুধু আত্মপ্রচার— বা ছেলে-মেয়ে-বউ-এর কথা। মানুষের সত্যি কিছু করার সুযোগ যত কমে যাচ্ছে, ততই যান্ত্রিক হবার আত্মপ্রসাদ, ঝুটো প্রাপ্তির বড়াই বাড়ছে।

চন্দন উঠে দাঁড়ায়, "কোন্ কাগজে বেরিয়েছিল রে খবরটা!... ঠিকঠাক জায়গাটা জানতে হবে। আমি যাব লোকটার কাছে। তোরা কি যাবি?"

দুই

অবশেষে লোকটার বাসা খুঁজে পাওয়া গেল। জাতীয় গ্রন্থাগারের পুরোনো খবরের কাগজের বিভাগে পরিশ্রম করে খবরটা খুঁজে জায়গাটার নাম বার করেছিল নীল। হুজুগের মধ্যে চটজলদি রওনা হওয়া, তাই যাত্রা ছিল কষ্টকর। এত তড়িঘড়ির ব্যাপার বলে তমাল এল না। ভিড়ে কুঁকড়ে, ফেরিওয়ালার দানাপানি নিয়ে স্টেশনে নেমে, একে অপরের শিরদাঁড়া ঠুকে নিজেদের সোজা করে তুলতে হয়েছিল। তারপর বিচিত্র ট্রেকারে লোহা আঁকড়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে যেতে ওদের দাঁড়াগুলোয় বুঝি ফের দাঁড়ি পড়ে যায়। তার সঙ্গে ঝুলিতে জমা পড়ে কিছু চোস্ত দেহাতি বুলি। গঞ্জে পৌঁছে অবশ্য বিস্তর মাথা খাটিয়ে গল্প-বলা লোকটি সম্পর্কে জানা নানা গল্প বলে দীর্ঘ সময় পরে শেষ বিকেলের দিকে একজনের সাহায্যে গন্তব্যের হদিশ পায় ওরা। টানা লম্বা গলি, তার মাথার প্রথম ডেরাটি থেকে কোনো খবর মেলে না। দ্বিতীয় জন অবশ্য বাসাটা দেখাতে পারে। যে-লোকটা লুঙ্গি গুটিয়ে উবু হয়ে বসে উনুন মেরামত করছিল সে বলে, "আমিই জয়প্রকাশ।" তারপর জলদি উঠে গায়ে একটা ফতুয়া চাপিয়ে নেয়। হয়তো চুলেও আঙুল চালিয়েছে। কারণ শ্রমিক থেকে ঝটিতি মধ্যবিত্ত হয়ে উঠেছে চেহারাটা। কথক বলে এখন বিশ্বাস করা যায়। কথার মাঝে সে হিন্দি বাংলা ইংরেজি কাগজে বেরোনো খবরের কাটিং এনে দেখায়। দু-একটায় তার ছবিও আছে। চন্দন বা নীল সাংবাদিক নয় জেনে জয়প্রকাশের উৎসাহ কমে যায়। তার কৌতূহল মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। কলকাতা থেকে শাখা লাইনের বাজে ট্রেনে করে স্রেফ আলাপ করতে এত দূর

এসেছে বলে মানতে পারে না। তাছাড়া নতুন কোনো বায়নার ব্যাপার হলেও কথা ছিল। ফলে জয়প্রকাশ তেমন কথা খুঁজে পায় না। ওর এই হাতড়ানোর পর্বেই দু'জনে লোকটার গমগমে স্বর আর মিঠে বাচনভঙ্গি খেয়াল করে। খেয়াল করে শ্রমিক পাড়ার কোয়ার্টারে এক ফালি লম্বা ঘর, পেছনে নিশ্চয়ই রান্না-স্নানের ব্যবস্থা আছে।

দুই গেলাস জল ছাড়া কিছু মেলে নি। না-বলার মতো করে ভেতরে বসার আমন্ত্রণ মিলেছিল। বাধ্য হয়ে রাতের আশ্রয় সম্পর্কে খোঁজ নেয় ওরা। তখন অবশ্য জয়প্রকাশ উদ্যোগী হয়ে খানিক দূরের মোড়ে এক প্রায়-ঝুপড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে। পাশেই রুটি-তরকারির দোকান আছে। খেয়েই ওরা শুয়ে পড়ে। তখনই ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে।

দোকানে নাস্তা করে সকালেই কোয়ার্টারে পৌঁছে যায় ওরা। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অপেক্ষায় ছিল জয়প্রকাশ। আজ তার গল্প-বাজি করার ফরমাশ ছিল না। কলকাত্তাইয়া দু'জনকে সে ভালো করে বুঝে নিতে চায়। ফলে আজ তার প্রশ্নের পরিমাণ বেশি। চাকরির বৃত্তান্ত দিতে হয় ওদের। পার্টটাইম, তায় অ্যামেচার, ফলে লেখক-পরিচয় দিতে লজ্জা পায় নীল। গল্পের টানে, তাও সরাসরি না শুনে এত আকৃষ্ট কেউ হতে পারে জেনে অবাক হয় জয়প্রকাশ। চন্দন বলে, "আপনি তো জোগাড় করে আর বানিয়ে শুধু গল্প বলেন না, এখন নিজেও গল্পের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই অর্থে আপনি মানেই গল্প। তেমন জ্যান্ত-গল্পের টান খুব জোরদার ব্যাপার।" সে নিজের ছেলেবেলার সেই বাসনার কথা জানায়। শুনে কেমন আনমনা হয়ে মাথা নাড়তে থাকে জয়প্রকাশ। এবার বোধহয় ওদের ছুটে আসার কারণ খানিক আন্দাজ করতে পারে। ভাবে, সে যেটা দায়ে পড়ে করে, সেটা নিজে পছন্দ করে কেউ সারাজীবন করতে চায়। চন্দন বলে, "স্কুলে স্কুলে এমন স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল।" জয়প্রকাশ হাসে, "তাহলে আমার পেটের চিন্তা কমত আরো।" নীল বলে, "তখন আর অনন্য থাকতেন না, ভিড়ের মাঝে আর-এক শিক্ষক হয়ে থাকতেন। রোজ রোজ এত নতুন জায়গা নতুন মুখের অভিজ্ঞতা হতো না। বৈচিত্র্যের মজাই তো আলাদা। দুনিয়ার সেরা ধনীরা শুধু একঘেয়েমি কাটাতে কত অবিশ্বাস্য সব কাণ্ডে বিপুল টাকা খরচ করে।"

আড্ডার মাঝে গৃহিণীর গলা ভেসে আসে, চা আসে, তবে জয়প্রকাশের হাত ঘুরে। মাঝে-মধ্যে দুই খোকার মুখ পরদার ফাঁক দিয়ে নড়ে। চন্দন ভাবে কিছু মেঠাই আর চকোলেট আনলে হতো। কিছু টাকা বার করে কথকঠাকুরের হাতে গুঁজে দেয়। লোকটা 'না-না' করলে বলে, "আপনি তো আমাদের গল্পই শোনাচ্ছেন। খুব ভালো হতো যদি কোথাও গিয়ে আপনার গল্প-বলার অনুষ্ঠান শুনতে পারতাম। অনেক কিছু একসাথে পাওয়া যেত।"

হঠাৎ সব গল্প হারিয়ে যায়। কথা আর তেমন দানা বাঁধতে চায় না। কয়লা ভাঙা, ঘুঁটে ছেঁড়া, মশলা বাটার শব্দ ঘুরেফিরে ষাট-সত্তরের গন্ধ ফিরিয়ে আনতে থাকে।

তিন

বিকেলে ওরা একসাথে বেরিয়েছে। পুরোনো মন্দির, নতুন হনুমান মন্দির আর টিলা-পাহাড় দেখেছে। এখন নদীর পাশে টানা বালির চরে বসে-যাওয়া আর-এক মন্দিরের আহত মাথা

দেখতে পেল। গোপনে-যাওয়া অতীত বেপরোয়া হয়ে সময়ের খবরদারি এড়িয়ে ঝাঁপ খুলতে চায় যেন। নানা কাজে আসা লোক আর স্নানার্থীর মুখ মারফত ইতিহাস-ভূগোলের রহস্য-বার্তা পাঠায়। চন্দন আর নীল কুহককে পড়ে আটকে থাকে জায়গাটায়। এখানে তীজনবাঈ পাণ্ডবানি শোনাতে এসেছিল। তখনই জয়প্রকাশের সঙ্গে আলাপ হয়। "সে অনেক বড়ো গল্প বলিয়ে। মহাভারতের বাইরে তাকে বেরোতেই হয় না। এত বড়িয়া মহাকাব্যের মাঝে বেঁচে থাকা দারুণ ব্যাপার। আমার মতো হাতড়ে বেড়াতে হয় না। অবশ্য প্রথম দিকে বহুত ঝামেলা সামলেছে বাঈ। তাকে একঘরে করেছে, বাড়িছাড়া করেছে। ... এখানে আমাকেও অবশ্য কম নাস্তানাবুদ করে নি। এখনও অনেকে সুযোগ পেলেই বাগড়া দেয়... সেবারে বাঈ বলার নানা কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে। লোকচরিত্র নিয়ে জানকারি দিয়েছে। তবেই-না এত কিসিমের এত আসরে মত-মর্জি সামলাতে পারি! আরো অনেক এরকম লোক আছে যারা নানা কায়দায় এরকম গল্প বলে বেড়ায়। তাছাড়া ওই পটুয়া না পটকথা কী একটা আছে না? ফল্গু-ধারার মতো গল্প বইতেই থাকে, লোকে সবসময় টের পায় না। এ-মন্দিরের তো কত গল্প শুনলেন। সবটা কি জানা গেল? যে আধা-শরীর ভেতরে ঢুকে আছে, তাতে কত গল্প চাপা রয়ে গেছে। রোজ বাসে-ট্রামে জিনিস বেচতে লোকে গল্প বলে। বিজ্ঞাপনে গল্প বলে। মিথ্যে ঢাকতে গল্প বলে কতরকম।"

আলো মিলিয়ে যাবার আগে আবছায়ায় মুগ্ধ হয়ে আছে নীল আর চন্দন। বুঝি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে। হয়তো মন্দির ছেড়ে বালি সরে যাবে। নদীর পাড়ে ধস নেমে যাবে, পুরোনো কোনো দিনে জেগে উঠবে মন্দির। মন্ত্র আর ঘণ্টাধ্বনির মাঝে সখীর দলের সাথে সাঁঝবাতি নিয়ে আসবে রাজকন্যা।

দু'জনকে নীরব দেখে জয়প্রকাশ বোঝে তার কথা আর টানছে না ওদের। শেষদিকে কি বকোয়াস করছিল সে? শহুরে বাবুদের খুশি করা আসান কাম নাকি? ওরা কী ভেবে এসেছে আর কী দেখছে! হয়তো মেলাতে পারছে না। সেও চুপ করে কিছু ভাবে। অন্ধকারে সামনের ছবি বিলকুল বদলে যায়। এই প্রথম এতক্ষণ এমন সময় এখানে বসে আছে সে। ওরা না এলে হয়তো বসাও হতো না। জলের শব্দ বাড়ে, নদী হয়তো এগিয়ে আসে। আকাশও নেমে আসে জলে। মন্দিরটা সত্যিই যেন কিছু বলতে চায়। তাগাদা দেয় জয়প্রকাশকে। সে জবানদার, তাকে নিজের কথা, দেশের কথা বলতে তো হবেই। তাই সে নড়ে বসে, "মাঝে-মধ্যে আজব ঘটনা হয়, জানেন! একটা গল্প বলছি, আবেগ এসে গেছে, কখন মাঝপথে সেই ধরনের অন্য একটা গল্পে চলে গেছি। তখন থামার আর কোনো উপায় নেই। কোথাও হয়তো আনপড় এলাকা, কি মেলার কোনো মঞ্চে আছি, আনসান বলার ভূত চাপল মাথায়। সামনের লোক দেখে, মেলার চেহারা দেখে যেমন ইচ্ছে গল্প বানিয়ে যাই। আমি বুঝি যে, কিচ্ছু খাড়া হচ্ছে না। হয়তো আদপে গল্পই হচ্ছে না। কিন্তু লোকে হয়তো ভাবছে নয়া কিসিমের বড়িয়া কোনো কিস্‌সা বলছি। যেমন উল্লাস তেমন হাততালি, আমার দালালরাও খুব খুশি। আরো অর্ডার বাড়ে!

দু-এক বার ফেঁসেও যাই, বুঝলেন! বানানো গল্পের ফাঁক ধরে ফেলে অনেকে। হয়তো

তাল মেলানো গেল না, হারিয়ে গেল খেই। গুঞ্জন করে জনতা। তখন কোনোরকমে সামলে দিই। এই যে আধা-শোনা, আধা-বোঝা, আনমনে বসে-থাকা মুখগুলোর মাঝে এত ফারাক, এত ফাটল থাকে, তার জন্যেই ইচ্ছেমতো বলার সাহস হয়, যার জন্যে বাড়তি মজা পাই। লোভেই তো মানুষ ঝুঁকি নেয়! আবার সেই-সব আলগা জোড়-ছাড়া ভাবের জন্যই শেষদিকে মেরামত করতে পেরে অন্যরকম মজা পাই।

একটা মেয়েদের স্কুলে একবার এক ছাত্রী মাঝপথে আচমকা প্রশ্ন করে বসে। গল্পের এক চরিত্রের আচরণের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হই। গল্প শেষ হতে-না-হতেই মেয়েটি আবদার করে সে-ও একটা গল্প বলবে। ছুটির দিন, সময়ের সমস্যা নেই। কেউ বাধাও দিল না। তাই পেশাদার আমাকে বাজারের কথা ভেবে শুনতেই হয়। তার গল্প হলো— একটি মেয়ে চুলে তেল দেয় না, ভালো করে বাঁধেও না। লালচে রুক্ষ চুল, কালচে মোজা আর ময়লা জামা পরে সে পড়তে আসে। শিক্ষিকা তাকে বকেন, বোঝান, লাভ হয় না। বন্ধুরা তার সাথে কথা বলে না, খেলে না। সে শুধু চুপ করে নিচু মাথায় বসে থাকে। তারপর একদিন এক নতুন দিদিমণি আসেন। তিনি তার সাথে আলাদা করে কথা বলেন। গল্পের মাঝে নানা কথা জানতে চান। নিজের গল্পও বলেন। একসময় মেয়েটা বোঝে, ক্লাসের অন্যরা তাকে হিংসে করতে শুরু করেছে। দিদিমণির বোঝানো শুনে কিছু ভালো মেয়ে তার সঙ্গে কথা-বলা শুরু করে, পড়ায় সাহায্যও করতে থাকে। তারপর মেয়েটার বাড়ির লোককে ডেকে পাঠায়। এরপর থেকে চুলে তেল পড়ে, বিনুনি হয়। সফেদ হয় জামা-মোজা। মেয়েটা হাসে, খেলে, পড়া বলতে পারে।... জানেন অমন কাঁচা ইচ্ছেপূরণের গল্প শুনে এমন গুস্‌সা হলো— এই মেয়ে কি-না আমার গল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলে! বললাম, 'মেয়েটা অমন নোংরা হয়ে থাকত কেন?' সে বলে, 'আরে এই সওয়ালই তো দিদিমণি করেছিল! তখনই জানতে পেরেছিল, মেয়েটির মা বেঁচে নেই, চাচির কাছেই থাকে। তারপর দিদিমণির কথা শুনে চাচি নরম হলো বলেই তো মেয়েটা বদলাতে পারল!'

সেদিন বাসায় ফেরার পথে মনে হলো মেয়েটা আমাকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছে! এটা নিশ্চয়ই ওর নিজের গল্প! তার মাঝে ইচ্ছে করে ফাঁক রেখে আমার গল্পের দুর্বলতা ধরিয়ে দিতে চেয়েছে! নাকি অন্য কিছু? তাহলে আমার গল্পে কি যুক্তি ঠিকমতো থাকছে না? বলায় গলতি থেকে যাচ্ছে? ... সেই তখনই মনে হলো, এবার থেকে নিজের কথাই বলব। গল্প বানাব। অন্তত যেখানে সুযোগ পাব। মনে ভেবে অভ্যাস করতে থাকি। যা জীবনে কখনো করি নি, ফাঁকা মাঠে গিয়ে গাছের সামনে বানানো সেই-সব কথা আওড়াতে থাকি। যত বলি, তত বুঝি যে অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে হরেক জায়গায়। শোধরাই আর পালটাই। বড়ো জায়গা হলে প্রচলিত গল্প আর ছোটো বা ঘরোয়া আসরে নিজের কিস্‌সা শোনাতে থাকি। আমার ছোটোবেলার কষ্ট, বড়োবেলার অনটন, হতাশার শেষে চাকরি, তার শেষে চাকরি যাওয়া— মিলিয়ে-মিশিয়ে বলার সময় কখনো একদিকে কমাই, তো অন্য দিকে বাড়ে। একেবারে অন্যরকম তৃপ্তির অনুভূতি পেতে থাকি। কখনো এমনও মনে হয়, ভাগ্যিস চাকরিটা গেছিল! নইলে কতগুলো দরজা জানালা না-খোলাই থেকে যেত।

প্রথম দিকের এই আনন্দ হাওয়া হয়ে যেতে বেশি সময় লাগল না। টের পেলাম নিজের গল্পের যে-জায়গায় মনের যে-ভাবটা প্রকাশ করতে চাই তা ফসকে যাচ্ছে। পিছলে যাচ্ছে একান্ত আপন কথাগুলো। সবার সামনে তা আর বলে উঠতে পারছি না। খুব যে স্পর্শকাতর গোপন কিছু বলতে চাইছি, তা তো নয়! কিন্তু কথার মধ্যে ভেতরের ব্যাপারটা বেরিয়ে আসছে না। শব্দগুলো কমজোরি হয়ে যাচ্ছে, গোছানো যাচ্ছে না বাক্যগুলো। মানে সাজানোর অভাবে, বুঝলেন, সাজানো কথার ফুলঝুরি হয়ে যেতে লাগল। আশ্চর্য কী জানেন, ওই ছোটো মেয়েটা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। সারা জীবনের সবাইকে ছেড়ে লড়ছি ওর সাথে। কিছুতেই ওর চিন্তা তাড়াতে পারছি না মন থেকে। কেমন সোজাসুজি অথচ ধারালো ভাবে গল্প বলে গেল! এটা ভুলি কী করে যে আমার গল্পের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজের ঝাঁপি খুলেছিল! আমার আপাত মহানতাকে, জবানদারের উঁচু আসনকে টলিয়ে দিতে তামাশা করেছিল!

সেই থেকে হেরে চলেছি বুঝলেন! আসরে যাই, কিন্তু আর শান্তি পাই না। পার্মানেন্ট না হলেও এখন এটাই একটা চাকরি বলে মনে হয়। এখন যত গল্প বলি, বুঝি যে, আদতে গল্প বলতে কিছু পারছি না। আসর না জমলে সর্বনাশ। তাই ভয়ে ফিরে যাচ্ছি পুরোনো গল্পে। আর এখন মনে হচ্ছে, আসলে মেয়েটা নয়, আমার আসল শত্রু তার পিছনে আছে। সে হলো গিয়ে তার দিদিমণি। সে-ই তো আসল কাজটা করে দিয়ে গেছে। তার সাথে আমি পেরে উঠব কেমন করে? ... সামনের ওই পাতালে-ঢোকা মন্দিরের চুড়ো আর দেখতে পাচ্ছেন না তো? অথচ ওটা আছে। তার নীচে আরো অনেক বেশি কিছু। ওই ডুবে-থাকা দিদিমণি ডুবিয়ে দিচ্ছে আমায়।"

চার

চন্দন আর নীল ফিরতি ট্রেনে কাটা-ছেঁড়া করে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে। চন্দন বলে, "দিদিমণি নয়, মেয়েটার বলার ধরন লোকটাকে চাপে ফেলে দিয়েছে। দিদিমণি যা-ই করুক, এ তো তার নিজের গল্প, একেবারে ভেতর নিংড়ে প্রকাশ করেছে।"

নীল হাসে, "ভেতর নিংড়ে বার করতে গেলে অনেক সময় ঘন কালো অম্লরসও ঝরে পড়ে। তাতে বক্তার বসন ঘুচে যেতে পারে। শ্রোতার সহ্যের বাইরেও চলে যেতে পারে। তমাল সেদিন যা-ই বলুক, পরদা বা হোর্ডিং-এ ঝুলন্ত গল্প কখনো হুমকি দিতে পারবে না। চরম খারাপ সময়েও গল্প পিছু হটে, কখনো লুকিয়ে, ওত পেতে থাকে। নতুন ভঙ্গি-ভাষার ছদ্মবেশ জুটিয়ে নিয়ে পথে এসে দাঁড়ায়। তখন সে যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। প্রথম চোটে বুঝতে না দিয়ে হয়তো থমকে দেয়। আবার উসকে দেয়, সাহস জোগায়। মুখচোরা মেয়েটাকে স্পর্শ করতে পেরেছিল, সেটাই জয়প্রকাশের সাফল্য। আবার মেয়েটা আমাকে স্পর্শ করেছে। তার জেরে এই বাপ-মা-হীন সময়ের ফসল কিছু একটা নামাতে পারব বলে মনে হচ্ছে।"